দৈনিক ইত্তেফাক

৮৮

তারিখ ... 03 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৭

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষক রাজনীতি

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের রাজনীতি এখন একটি বেশ আলোচিত বিষয়। এ রাজনীতির কারণে শিক্ষকরা সনাতন দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররা-এ ধরনের অভিযোগ এখন আর ছাত্ররাই করছে না, অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের অভিযোগ হরহামেশা শোনা যাচ্ছে। বুয়েটের উপাচার্যের পদত্যাগের পর বুয়েট ক্যাম্পাসে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনার পেছনেও কাজ করছে শিক্ষক রাজনীতি। এ অভিযোগের পেছনে সত্যতা কতটুকু, তা জানা না গেলেও যা সত্য তা হচ্ছে গত ৪ মে উপাচার্যের পদত্যাগের পর পরিস্থিতির সেখানে কোন উন্নতি হয়নি। শিক্ষকরা এখনও কর্মবিরতি পালন করে চলছেন। শিক্ষকদের এই রাজনীতি মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে যাঁরা আসীন, তাঁদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। কখনো সখনো তাঁদের বিবৃতি ও মন্তব্যও ছাপা হয় সংবাদপত্রে। শিক্ষকদের এই রাজনীতি নিয়েই একটি মন্তব্য করেছিলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। গেল মাসে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য শিক্ষকরাও দায়ী। এটি একটি বড় ধরনের অভিযোগ। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের সূত্রপাত আজকের নয়। পাকিস্তান আমলেও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও ক্যাম্পাস, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যায়নি। ১৯৭৪ সালের ৫ এপ্রিল মহসিন হলে ছাত্রলীগ নেতা কোহিনূরসহ সাতজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে যে সন্ত্রাসের যাত্রা শুরু, আজো তা অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে ক্যাম্পাস সন্ত্রাস তথা ক্যাম্পাস হত্যাকান্ডের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন, দলীয় কোন্দল কিংবা বহিরাগতদের দায়ী করা হয়ে থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সন্ত্রাসের জন্য দায়ী এই অভিযোগ কখনও শোনা যায়নি। সম্ভবতঃ এই প্রথমবারের মত এই অভিযোগটি প্রকাশ্যে শোনা গেল। আর অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছে এমন একজনের মুখ থেকে, যিনি শুধু দেশের রাষ্ট্রপতিই নন, তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও বটে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর যখন স্বয়ং এ ধরনের কথা বলেন, তখন এর গুরুত্ব পায় বৈকি!

রাষ্ট্রপতি যেভাবেই কথাটা বলেন না কেন তিনি শিক্ষকদের অভিযুক্ত করেছেন। এই অভিযোগের জবাব শিক্ষকরা দেননি। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির তাৎক্ষণিক মন্তব্য আমার চোখে পড়েনি। আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। অভিযোগের কাঠগড়ায় আমাকেও দাঁড় করিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি কি অসত্য কিছু বলেছেন? না, তিনি অসত্য বলেননি। সাদা, নীল আর গোলাপী গ্রুপের যে কথা তিনি বলেছেন, তা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সত্য না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সত্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রধানতঃ দুটো গ্রুপে বিভক্ত। একটি নীল, অপরটি সাদা। এক সময় গোলাপী দলের অস্তিত্ব ছিল। এখন তাদের অস্তিত্ব তেমন একটা নেই বললেই চলে। নীল দলের সমর্থকরা মূলতঃ আওয়ামী লীগের সমর্থক, অন্যদিকে সাদা দলের সমর্থকরা আবার জাতীয়তাবাদী তথা বিএনপির রাজনীতিকে সমর্থন করেন। নীল দলের অনেকে আছে, যারা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা- মন্ডলীর সদস্য। এর অর্থ শিক্ষকরা সরাসরি জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে এদেরকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় রাজনৈতিক দলগুলোর পেছনে। গত সংসদ নির্বাচনের সময় দেখেছি শিক্ষকদের কেউ কেউ দু'টি বড় দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়া ঠিক কিনা। এর পক্ষে যেমনি যুক্তি রয়েছে, ঠিক তেমনি এর বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে।

শিক্ষকরা সরাসরিভাবে সরকারী কর্মচারী নন। তাঁরা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য। সরকার তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং তাঁরা সরকারের কাছেও দায়বদ্ধ নন। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে আসছে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে না। তবে দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য এই অধ্যাদেশ কার্যকর হয়নি। যেখানে এই অধ্যাদেশ কার্যকরী হয়নি, সেখানে সরকার সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও, দেশের শিক্ষক সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী মহলে এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার লালনক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং সব ধরনের প্রতিকূলতা ও 'চাপ' উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বশাসিতভাবে পরিচালিত হবে এটাই ছিল সবার কাম্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে উপাচার্য পদের জন্য শিক্ষকদের রাজনীতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, অযোগ্য শিক্ষকদের উচ্চপদে নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দলীয়করণ ইত্যাদি কারণে বিগত সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংসদীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটি বেশিদিন কাজ করতে পারেনি।

শিক্ষকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা কোন অপরাধ নয়। বরং এর ফলে জাতীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। শিক্ষকদের মেধা ও গুণ যদি জাতীয় রাজনীতিতে যোগ হয়, তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত। জার্মানীতে শিক্ষকরা বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে জড়িত। তাঁরা দলগুলোকে উপদেশ দেন, নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেন। যুক্তরাষ্ট্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। এ ক্ষেত্রে তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করে জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। সরাসরিভাবে প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নেন না। কেননা এর ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটাই হওয়া উচিত। এটাই মঙ্গল।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনীতি করেন। এই রাজনীতি করার পেছনে কাজ করে তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ উপাচার্যের পদে আসীন হওয়া। শিক্ষক নেতারা রাজনীতি করেন ঐ পদটি পাবার জন্যই। এবং তাঁরা পানও। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, উপাচার্যের পদগুলো পেয়েছেন সরকারের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষক নেতারা। সরাসরি সরকারী অঙ্গ সংগঠনের সাথে যাঁরা জড়িত, তাঁদেরকেই উপাচার্য করা হয়েছে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুবা অন্য আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটা যে বর্তমান সরকারের আমলেই ঘটছে তা নয়। বিগত সরকারের আমলেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দলীয়করণের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের পেছনে সত্যতা আছে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বলে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা ঠিক করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবেন। ঐ প্যানেল থেকে একজনকে চ্যান্সেলর উপাচার্য পদে নিয়োগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীও অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায় এবং তিনি প্যানেল থেকে তার দলীয় সমর্থককেই উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন। এক্ষেত্রে প্যানেল নির্বাচন যিনি সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন, তিনিও উপাচার্য পদটি পেতে পারেন। সিনেটে সর্বোচ্চ ভোট যিনি পেয়েছেন, তিনিই যে উপাচার্য হবেন, তার কোন গ্যারান্টি নেই। এটাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের দুর্বলতা। শিক্ষক নেতারা সঙ্গত কারণেই তিন সদস্য বিশিষ্ট প্যানেলে ঢোকার চেষ্টা করেন। দলীয় আনুগত্য নিশ্চিত করেন। আর দলীয় আনুগত্য নিশ্চিত করতে শিক্ষক সমিতির নেতাদেরকে বিশেষ ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হাতে রাখার চেষ্টা করেন। ঘন ঘন মন্ত্রী পাড়ায় যান। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে সরকারী দলের ছাত্র নেতারাই এই উপাচার্য নির্বাচনে নিজেদেরকে জড়িত করেছেন। তাদের প্রার্থীকে নিয়ে তারা সরকারের উচ্চপদে দেন-দরবার করেছেন। ফলে যিনি উপাচার্য পদে নিয়োগ পান, তার কাছে তখন ছাত্র নেতাদের দুর্নীতি, চাঁদাবাজি চোখে পড়ে না। ছাত্র নেতারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অভিযুক্ত হলে, তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন স্বয়ং উপাচার্য। যে সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত, সে তো প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাসীই। এবং যিনি সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেন, তিনিও সন্ত্রাসী। সম্ভবত রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় এই বিষয়টি এসেছে। যে কারণে শিক্ষকদেরকে তিনি সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

> *নীল দলের সমর্থকরা মূলতঃ আওয়ামী লীগের সমর্থক, অন্যদিকে সাদা দলের সমর্থকরা আবার জাতীয়তাবাদী তথা বিএনপির রাজনীতিকে সমর্থন করেন। নীল দলের অনেকে আছে, যারা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা- মন্ডলীর সদস্য। এর অর্থ শিক্ষকরা সরাসরি জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। জাতীয় রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে এদেরকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় রাজনৈতিক দলগুলোর পেছনে। গত সংসদ নির্বাচনের সময় দেখেছি শিক্ষকদের কেউ কেউ দু'টি বড় দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নেয়া ঠিক কিনা। এর পক্ষে যেমনি যুক্তি রয়েছে, ঠিক তেমনি এর বিপক্ষেও যুক্তি রয়েছে।*

শিক্ষক রাজনীতির সাথে উপাচার্য পদে নিয়োগের প্রশ্নটি জড়িত। আর উপাচার্য পদে নিয়োগের প্রশ্নটি যেহেতু একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, সেহেতু শিক্ষক-নেতারা ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর, বিশেষ করে দু'টি বড় ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল) উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা দিনে দিনে বাড়ছে। কেননা জাতীয় রাজনীতি আজ অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির উপর নির্ভরশীল। একটা কথা এভাবে বাজারে চালু রয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, তাহলে সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। উপাচার্যের পদটি যদি অরাজনৈতিক করা যায়, তাহলে শিক্ষক-নেতাদের ছাত্র তথা রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে। এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজন রয়েছে বলেই শিক্ষক নেতারা ছাত্র নেতাদের দ্বারস্থ হন, মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হন, সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দেন-দরবার করেন। এই প্রবণতা উচ্চ শিক্ষার জন্য মঙ্গল নয়। সরকারেরও উচিত বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির ব্যাপারে নাক না গলানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজের মতই চলতে দেয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটই নির্বাচন করবে কে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন। সিনেটে সর্বোচ্চ ভোট যিনি পাবেন, চ্যান্সেলর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেবেন। তেমনি যিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাবেন তিনিই হবেন উপ-উপাচার্য। বর্তমানে উপ-উপাচার্য সরাসরিভাবে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা আসে এবং তা বিতর্কের সৃষ্টি করে। শোনা যাচ্ছে বর্তমান সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই দু'জন করে উপ-উপাচার্য নিয়োগ করতে যাচ্ছেন। এটা কাম্য নয়। এর ফলে দলীয় কোন্দল আরো বাড়বে এবং সরকারী দলের ছাত্র নেতারা আরো বেশি করে উপাচার্য নিয়োগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বেন।

উপাচার্য নিয়োগের এই যে রাজনীতি, এই রাজনীতির কারণে দেশের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তিটি এখন আর উপাচার্য হচ্ছেন না। সাধারণ মানের একজন শিক্ষক, যার উচ্চতর ডিগ্রী নেই, তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় উপাচার্য হচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন, এমন অনেক পন্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন, যারা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তারা কোনদিন উপাচার্য পদের জন্য বিবেচিত হননি। রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায় বলেই, একজন হোটেল ব্যবসায়ী, একজন আমলা উপাচার্য পর্যন্ত হয়ে যান (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)। উপাচার্য পদটির আরো পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। উপাচার্যের কাছে থাকবে শুধুমাত্র একাডেমিক বিষয়। প্রশাসন দেখবেন অন্য কেউ। পৃথিবীর সব দেশগুলোতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবে পরিচালিত হয়। উপাচার্যের কাছে সব ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত থাকে বলেই এই পদটির ব্যাপারে আগ্রহ অনেকের। উপাচার্যকে যদি শুধু একাডেমিক বিষয়গুলো দেখতে হয়, তাহলে এই পদটির ব্যাপারে 'প্রতিযোগিতা' কমে যাবে এবং ছাত্রনেতারাও আর সরাসরি জড়িত হওয়ার সুযোগ পাবে না। রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীই পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর হবেন, এটাও তুলে দেয়া উচিত। একজন জাতীয় অধ্যাপক, সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজন জ্ঞানী ব্যক্তি চ্যান্সেলর হতে পারেন। পৃথিবীর সব দেশে এটাই নিয়ম। ভারত ও শ্রীলংকাতেও এমনটি রয়েছে। আমাদের দেশে এমনটি হতে বাধা কোথায়।

ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি আজ শিক্ষক রাজনীতিও প্রশ্নের মুখোমুখি। রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন সন্ত্রাসের তাদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে ক্লাস না নেয়ার, জাতীয় রাজনীতির জন্য বেশী সময় ব্যয় করার। সন্ত্রাসের অভিযোগটি বাদ দিলে বাকি অভিযোগগুলোর পেছনে সত্যতা রয়েছে। দায়বদ্ধতা নেই বলেই শিক্ষকরা আজ তাদের মূল দায়িত্ব এড়াতে পারেন। উপাচার্য পদটিকে যদি 'অরাজনৈতিক' করা যায়, তাহলে শিক্ষক রাজনীতির ধরনও বদলে যাবে এবং শিক্ষকরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজেই বেশি সময় ব্যয় করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশেরই কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। তাদের অনেকেই মানবেতর জীবন-যাপন করেন। রাষ্ট্রপতি যাকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তিনি সেই অর্থে 'সন্ত্রাসী' হতে পারেন না। গুটি কয়েক শিক্ষকের জন্য সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। ❑